ইমানুয়েল কান্ট

হুমায়ুন কবির

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ

ভূমিকা

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রসিদ্ধ নেতা স্মাটসের সম্বন্ধে বলা হয় যে বুয়র যুদ্ধের সময়েও প্রতি রাত্রিতে তিনি কান্টীয় দর্শন অধ্যয়ন করিতেন। সে সম্বন্ধে একজন ইংরেজ দার্শনিক বলিয়াছেন যে এ রকম লোকের বিরুদ্ধে ইংরেজ সেনাপতিরা যে বারে বারে পরাজিত হইবেন তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। ভাবিয়া দেখিলে কিন্তু স্মাটসের কার্যকলাপের মধ্যে গভীর যৌক্তিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। যুদ্ধক্ষেত্রে মানুষের দৃষ্টি সাক্ষাৎ বর্তমান বা ক্ষণিকের প্রতি নির্দিষ্ট। কিন্তু ক্ষণিককে ক্ষণিক বলিয়া জানিতে হইলেও তাহার নশ্বরতাকে অতিক্রম করিতে হইবে। কেবল তাহাই নহে, যুদ্ধক্ষেত্রের উন্মাদনায় বুদ্ধির শান্ত সমাহিত দৃষ্টি যেমন প্রয়োজনীয় তেমনি দুর্লভ। ক্ষণিকের উত্তেজনায় স্থায়ী কল্যাণকে ভুলিবার সম্ভাবনা সেখানে বেশি—অথচ যুদ্ধক্ষেত্রের বিভ্রান্তির মধ্যে মুক্তির একমাত্র উপায় বুদ্ধির স্থির বিচার।

বর্তমানে বাঙলাদেশে বিভ্রান্তি এবং উত্তেজনার লক্ষণ এত তীব্র যে তাহাকে যুদ্ধক্ষেত্রের সঙ্গে তুলনা করা অসঙ্গত নহে। প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতা, ব্যক্তি এবং দলগত বিদ্বেষ, দার্শনিক দিকভ্রান্তি এবং ঐতিহাসিক বিভ্রম, রাজনৈতিক অস্থিরমতি এবং অর্থনৈতিক কুজ্ঝটিকায় চারিদিক এমন ধূমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছে যে তাহাতে যে কেবল দৃষ্টির ব্যাঘাত ঘটিতেছে তাহা নহে, জীবন ধারণের পক্ষেও তাহা প্রতিকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি করিতেছে। এ সঙ্কটের দিনে কান্টীয় দর্শনের নিরাবেগ ও সমাহিত বুদ্ধির সাধনা আমাদের জীবনে নূতন প্রেরণা আনিতে পারে, কারণ সে দর্শনের সিদ্ধান্তকে না মানিলেও তাহার বিচার-ভঙ্গি এবং মানসিকতা যদি আমরা গ্রহণ করি, তবে হয় তো আজিকার দিনে নূতন লক্ষের সন্ধান মিলিবে।

এ আশা যে দুরাশা নয়, তাহা মনে করিবারও কারণ রহিয়াছে। বাঙলাদেশে আজ যে চিন্তা এবং আদর্শের নৈরাজ্য, বিশ্বব্যাপী বিভ্রান্তি এবং অনিশ্চয়তার প্রাদেশিক বিকাশ হিসাবেই তাহার অস্তিত্ব। বাঙলার সমস্যাগুলিই ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে বৃহত্তর আকারে ধরা দেয়, এবং ভারতবর্ষের সমস্যা বিশ্বসমস্যারই অচ্ছেদ্য অঙ্গ। সভ্যতায় আজ ভাঙন ধরিয়াছে। সেই ভাঙনের ঢেউই বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন আকারে দেখা দিতেছে। সে ভাঙনের অর্থ যদি আমরা বুঝিতে চাহি, ভাঙনের মধ্যেও নূতন সৃষ্টির ইঙ্গিতের সন্ধান করি, তবে বর্তমানের সভ্যতার আঙ্গিক এবং উপাদান দুইয়েরই সঙ্গে নিগূঢ় পরিচয় প্রয়োজন। সে পরিচয়ের জন্য কান্টীয় দর্শন একেবারে অপরিহার্য, কান্টের চিন্তাধারা বর্তমান সভ্যতার আকৃতি এবং প্রকৃতিকে গভীরভাবে রঞ্জিত করিয়াছে। দর্শনের ক্ষেত্রে

যে আজিও কান্টীয় যুগ চলিতেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও কান্টীয় আপেক্ষিকতার প্রসার হিসাবেই অনেক দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক পদার্থবিদ্যার নূতন তত্ত্বগুলিকে বুঝিতে চাহিয়াছেন। রাজনীতি ও শিল্পশাস্ত্র, ইতিহাস এবং জীবতত্ত্ব—সমস্ত ক্ষেত্রেই কান্টীয় দর্শনের প্রগাঢ় প্রভাব প্রতিপদে ধরা দেয়। বর্তমান সভ্যতাকে নূতন করিয়া গড়িতে চাহিলেও তাই কান্টীয় বিশ্বদৃষ্টি বোঝা আমাদের জন্য প্রয়োজন।

বাঙলায় কান্ট সম্বন্ধে কোনোদিন বিস্তারিত আলোচনা হয় নাই। শুনিয়াছি যে বহুদিন পূর্বে একবার স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর এ সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করিয়াছিলেন, কিন্তু সে বহুদিনের কথা, এবং সে সম্বন্ধে খুব কম লোকই জানে। তাহা ছাড়া, সে যুগে ইংলন্ডেও কান্টীয় দর্শনের সম্যক উপলব্ধি হয় নাই, হেগেলীয় দর্শনের উপক্রমণিকা হিসাবেই সেদিন ইংরেজ কান্টীয় দর্শনের আলোচনা করিয়াছে। আজ কিন্তু দৃষ্টির মোড় ফিরিয়াছে, এবং তাহার ফলে বর্তমানের দার্শনিকের কাছে কান্টীয় দর্শনের তুলাদণ্ডেই হেগেলীয় দর্শনের বিচার। নানান কারণে দৃষ্টির এ পরিবর্তন, সে সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার এখানে প্রয়োজন নাই, তবে সেই পরিবর্তনের ফলে আজ কান্টীয় দর্শনের বিচার নূতন করিয়া শুরু হইয়াছে এবং তাহারই খানিকটা পরিচয় দেওয়া এই পুস্তিকার লক্ষ্য।

কান্টীয় দর্শনের দুর্বোধ্যতা প্রায় সকলেই স্বীকার করিয়াছেন, যদিও বহুক্ষেত্রে সে দুর্বোধ্যতা যে ভাষ্যকারেরই সৃষ্টি, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ভাষ্যকারের অক্ষমতা বা অপরাধ মানিয়া লইলেও কিন্তু কান্টকে সহজ বলা চলে না, এবং তাঁহার দর্শন সাধনার মধ্যেই এই দুরূহতার কারণ মেলে। তাঁহার মতে পূর্বের সমস্ত সহজ সিদ্ধান্ত এবং সমাধানই ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে, তাই দর্শনকে যদি আবার নূতন করিয়া স্থাপিত করিতে হয়, তবে কঠিন পথে না চলিয়া উপায় নাই। বিজ্ঞানের পদ্ধতি দর্শনে প্রয়োগ করিতে গিয়া অবশেষে সে পদ্ধতির সংকোচন ও সীমানির্দেশই কান্টীয় দর্শনের পরিসমাপ্তি, এবং শুরু ও সারার মধ্যে এই রূপান্তর তাঁহার দর্শন সাধনাকে আরও জটিল করিয়া তুলিয়াছে। বাঙলায় এ সম্বন্ধে বই লেখা যে দুঃসাহসের পরিচায়ক, সে কথা বোধ হয় সহৃদয় পাঠক মাত্রই স্বীকার করিবেন, এবং সেই দুঃসাহসের অজুহাতেই পুস্তিকার সমস্ত দোষ-ত্রুটির জন্য তাঁহাদের কাছে অনুমোদন বা অন্ততপক্ষে ক্ষমার দাবি করিব। বহু ক্ষেত্রেই ইংরেজি শব্দের প্রতিশব্দের অভাব অনুভব করিয়াছি, কারণ বাঙলায় দার্শনিক শব্দ-সংগ্রহ এখনো গড়িয়া উঠে নাই বলিলেও চলে। সংস্কৃতের বিপুল ভাণ্ডার হইতে শব্দ আহরণ করিতে পারি নাই, আমার সংস্কৃত জ্ঞানের একান্ত অভাব তাহার একমাত্র কারণ নহে। আমার বিশ্বাস যে সংস্কৃতে শব্দের যে দার্শনিক সংজ্ঞা আছে, বাঙলায় বহুক্ষেত্রেই তাহার লঙ্ঘন হইয়াছে। "সামান্য" বলিলে বাঙলায় স্বল্পেরই ছায়া মনে আসে, তাহার বিশ্বরূপের আভাস তাহার মধ্যে নাই। এসব ক্ষেত্রে 'সার্বিকের' মতন নূতন কথা ব্যবহারই আমার সঙ্গত মনে হইয়াছে।

পুস্তিকাখানির কতক কতক অংশ 'পরিচয়'-এ প্রকাশিত হইয়াছিল। সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এবং অন্যান্য যে সমস্ত বন্ধুর আগ্রহে এ প্রবন্ধগুলির রচনা, তাঁহাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। বাঙলায় এ ধরনের বইয়ে নূতনত্বের দাবি হাস্যকর, সাধারণ শিক্ষিত পাঠক এবং যাঁহারা দর্শনের ছাত্র, তাঁহাদের কাছে যদি বাঙলা ভাষায় কান্টের দার্শনিক তত্ত্বের সাধারণ বর্ণনাও বোধগম্য করিয়া আনিতে পারি, তবে আমার শ্রম সার্থক মনে করিব।

পরিশেষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চক্রবর্তী, বাঙলা প্রকাশ বিভাগের শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ রায় এবং শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেডের শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায়কে ধন্যবাদ জানাইতেছি, কারণ তাঁহাদের সহযোগিতা ভিন্ন এ পুস্তিকা এত সত্বর প্রকাশ সম্ভব হইত না।

কলকাতা
শ্রাবণ ১৩৪৬

হুমায়ুন কবির